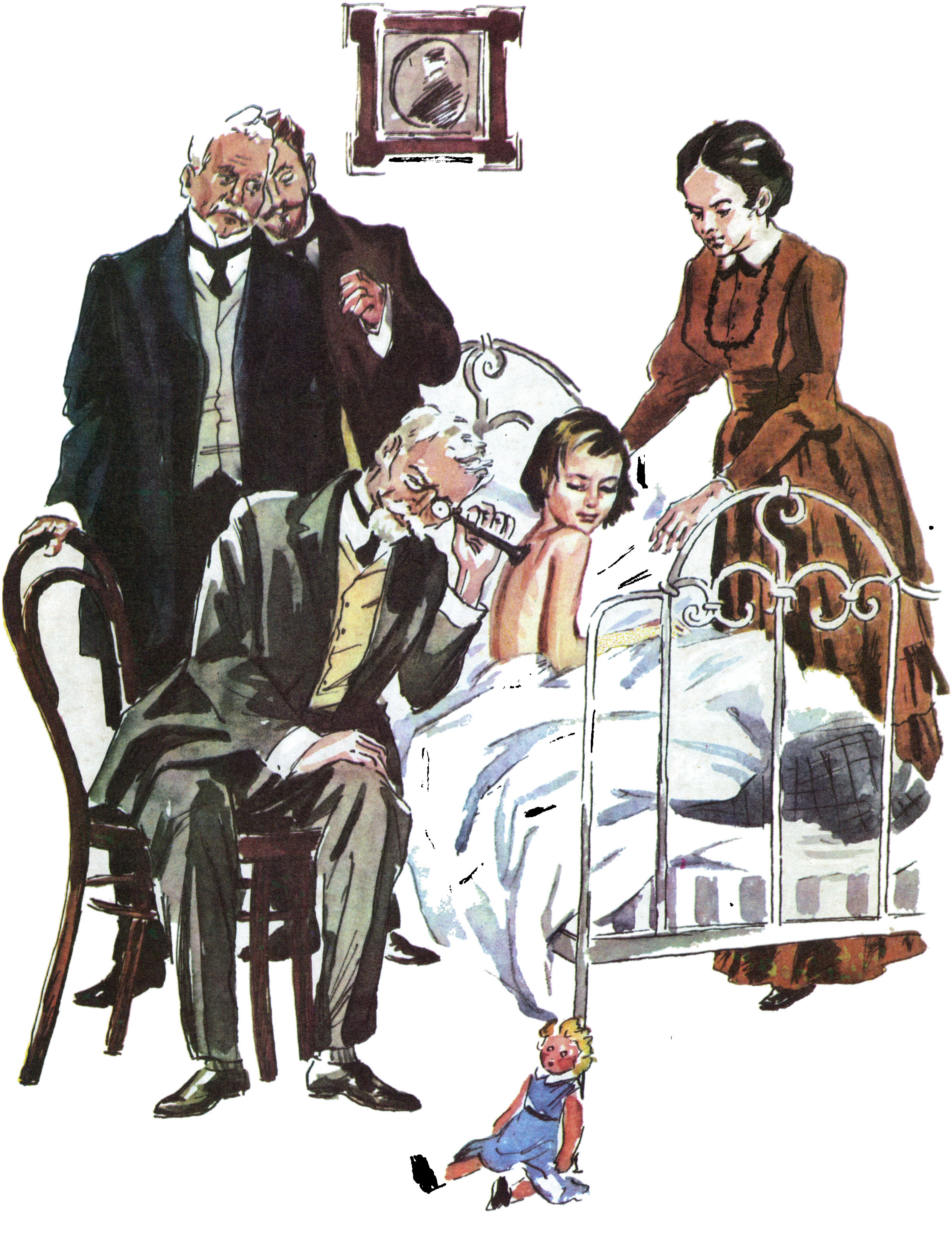
আলেক্সান্দর কুপ্রিন



হাতি



আলেক্সান্দর কুপ্রিন

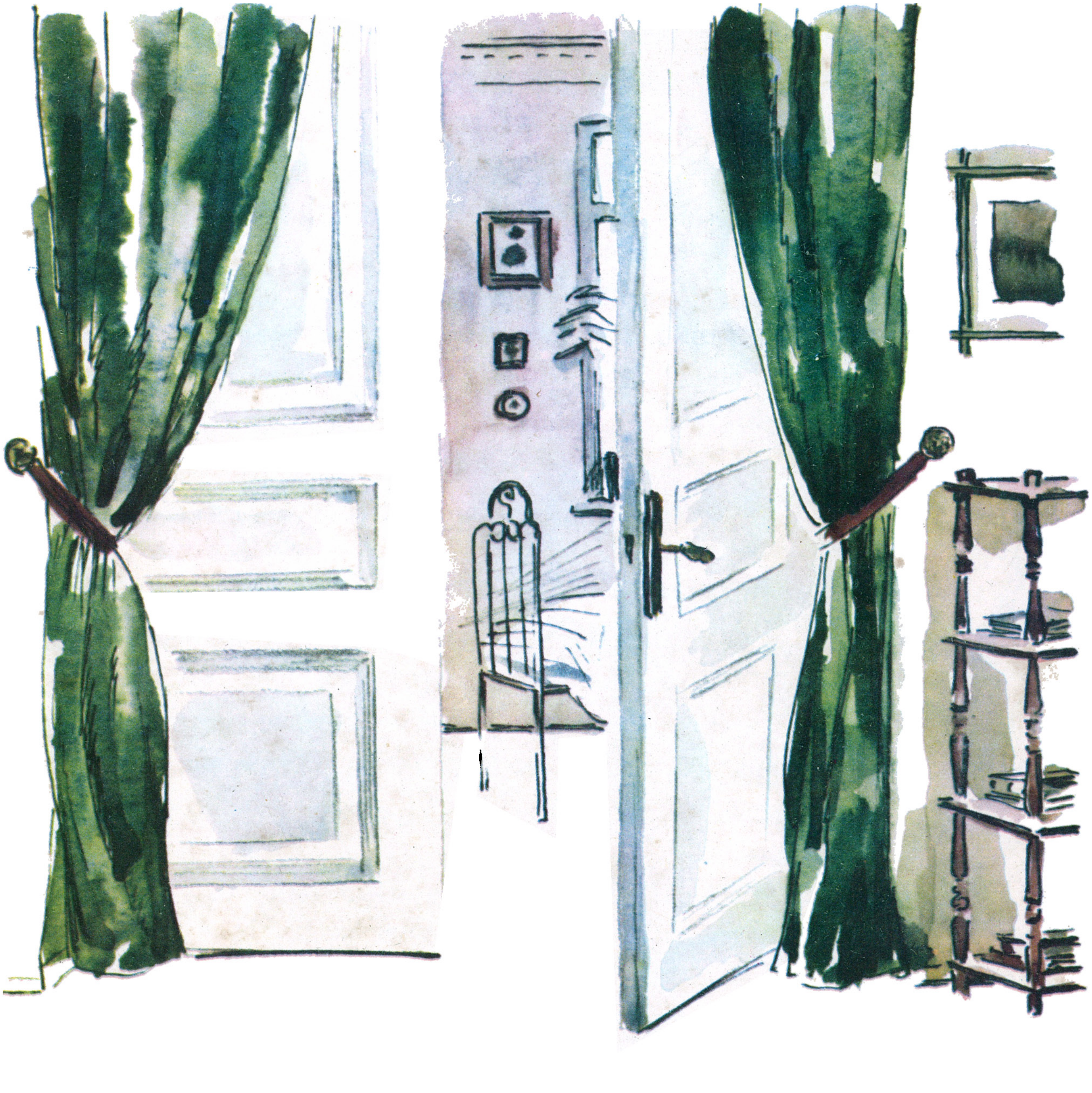
হাতি

রুশ ও সোভিয়েত চিরায়ত শিশু-সাহিত্য

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো





১

ছোট্ট খুকীটি অসুস্থ। রোজ তার কাছে ডাক্তার আসছেন, মিখাইল পেত্রভিচ; এঁকে সে অনেক-অনেক দিন থেকে চেনে। আর কোনো-কোনো দিন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন আরো দু'জন ডাক্তার, অপরিচিত। তাঁরা ছোট্ট মেয়েটিকে কখনো চিৎ করে, কখনো বা উপুড় করে শুইয়ে তার দেহে এখানে-ওখানে কান লাগিয়ে কী-সব শোনেন, চোখের পাতা নিচের দিকে টেনে ধরেন

আর দেখেন। তারপর সজোরে অর্থপূর্ণভাবে নিঃশ্বাস ফেলেন, মুখ-চোখ গম্ভীর হয়ে ওঠে তাঁদের, আর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকেন এমন ভাষায় যা সে বোঝে না।

তার ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁরা বসবার ঘরে চলে যান, সেখানে মা তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। সবচেয়ে বড়ো ডাক্তার যিনি — লম্বা-চওড়া, পাকাচুলো, সোনার ফ্রেম বাঁধান চশমা পরা — মা-র সাথে কী নিয়ে গম্ভীরভাবে আর অনেকক্ষণ ধরেই কথাবার্তা বলেন। দরজা তো ভেজানো নেই, তাই মেয়েটি তার বিছানা থেকেই সব দেখতে পাচ্ছে, সব শুনতে পাচ্ছে। বেশির ভাগই সে কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু সে জানে যে তাকে নিয়েই আলোচনা চলছে। মা ডাক্তারের পানে বড়ো-বড়ো, ক্লান্ত, কান্নাভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। বিদায় নিয়ে চলে যেতে গিয়ে বড়ো ডাক্তারটি উঁচু গলায় বলে উঠলেন:

— সবচেয়ে বড়ো কথা — ও যেন মনমরা হয়ে না থাকে। ওর যা মন চায় তাই করতে দেবেন।

— আঃ, ডাক্তার, কিন্তু কিছুতে যে ওর মনই যায় না!

— কী করা, জানি না... আচ্ছা, মনে করুন তো, অসুখের আগে কী-কী ওর ভালো লাগত। খেলনা... এটা-ওটা ভালোমন্দ খাবার...

— না, না, ডাক্তার, সে কিচ্ছুটি চায় না...

— ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখুন কোনো কিছুতে ওকে খুশি রাখা যায় কি না... হ্যাঁ, তা সে যাই হোক না কেন... আপনাকে সত্যি কথাটা বলে দিচ্ছি, যদি আপনারা তাকে হাসিখুশিতে, আনন্দে রাখতে পারেন তো সেটাই সবচেয়ে ভালো দাওয়াই হবে। জানবেন যে, আপনাদের মেয়ের যা অসুখ তা হলো জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য, এর বেশি আর কিছু নয়। আচ্ছা, আসি!

২

— নাদিয়া সোনা, লক্ষ্মী মা-মণি আমার, — মা বলতে লাগলেন, — কিচ্ছুতেই কি তোর মন যায় না মা?

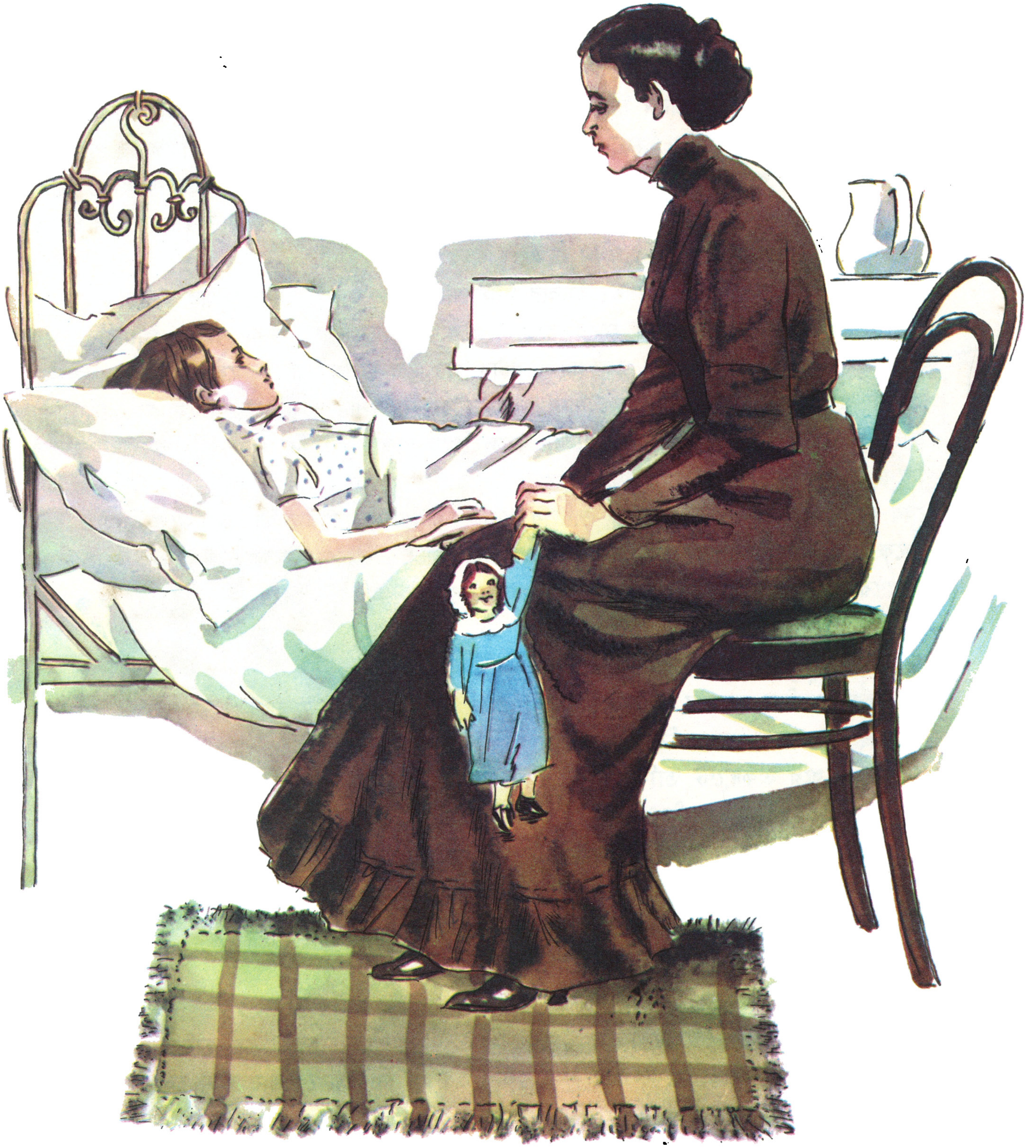
— না, মা, কিচ্ছুতেই মন যায় না।

— কেন মন যায় না, তোর সব পুতুলগুলো বিছানার ওপর এনে বসিয়ে দিই, কেমন? আমরা চেয়ার, গদি, টেবিল আর চায়ের সরঞ্জাম সব এনে রাখি, পুতুলগুলো চা খাবে, গপ্পো করবে — আজকের আবহাওয়া কেমন, ছেলেপুলেরা ভালো আছে কি না।

— থাকুক মা... আমার মন যাচ্ছে না... আমার যে কিচ্ছু ভাল্লাগে না...

— আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার লক্ষ্মী মেয়ে তো এটা, পুতুল দরকার নেই না হয়। কিন্তু, তবে না হয় তোর কাছে কাতিয়াকে কি জেনিয়াকে ডেকে আনি? ওদের তো তুই খুব পছন্দ করিস।

— দরকার নেই, মা। সত্যি বলছি, দরকার নেই। কিচ্ছু, কিচ্ছুটি আমার চাই না। আমার কিচ্ছু ভাল্লাগে না যে!



— তবে না হয় চকলেট নিয়ে আসি, কী বলিস?

কিন্তু মেয়ে আর উত্তর দেয় না, স্থির বিষণ্ণ চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। শরীরে কোথাও তার কোনো যন্ত্রণা নেই, এমন কি জ্বরজ্বালাও না। তবু দিন-দিন সে রোগা আর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তার দরকারী কোনো কিছু না করা হলেই বা কী, তার কাছে সব সমান, কিছুরই প্রয়োজন নেই তার। এভাবে সে শুয়ে আছে সারা দিন, সারা রাত — চুপচাপ, মনমরা। এক-আধবার আধ-ঘণ্টাটাকের জন্যে ঝিমুনি আসে বটে তার, কিন্তু ঘুমের ভিতরেও যা ধরা দেয় তার চোখে তা ধূসর, বহু দূরের, বিষণ্ণ যেন কী-এক, যেন হৈমন্তী বারিধারা।

যখন তার শোবার ঘরের দরজা বসবার ঘরমুখো খোলা থাকে, আর বসবার ঘরের দরজা — দূরের ঐ ঘরটার দিকে, তখন মেয়ে তার বাবাকে দেখতে পায়। সারা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন বাবা, আর কেবলই, কেবলই একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছেন। কখনো-কখনো এ ঘরে আসেন তিনি, বিছানার একধারে বসেন, চুপচাপ নাদিয়ার পায়ে হাত বোলান। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যান, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। কী-একটা সুরে শিস দেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, কিন্তু পিঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে তাঁর। এরপর অতিদ্রুত তিনি রুমাল বের করে একটা চোখে চেপে ধরেন, তারপর অন্য চোখটাতেও এবং নির্ঘাৎ রেগেমেগে নিজের ঘরের দিকে চলে যান। আবার শুরু হয় ঘরের মধ্যে পায়চারি, আর সারাক্ষণই সিগারেট, সিগারেট, সিগারেট... আর তামাকের ধোঁয়ায় সারা ঘরটা নীল হয়ে যায় তাঁর।

৩

কিন্তু একদিন সকালে রোজকার চেয়ে একটু খুশি মনে ঘুম ভাঙলো মেয়েটির। কী-যেন দেখেছে সে স্বপ্নে, অথচ ঠিক যে সেটা কী, কিছুতেই মনে আসছে না, মা-র চোখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো সে।

— কি মা, কিছু বলবি? — মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আর তখনই হঠাৎ করে স্বপ্নটা মনে পড়ে গেলো তার, ফিস্‌ফিস্ করে, ঠিক যেন কোনো গোপন কথা বলছে সেভাবে বলে উঠলো সে:

— মা... একটা হাতি... দিতে পারবে আমাকে? ঐ যেমন ছবির বইয়ে আঁকা সেরকম না কিন্তু... পারবে?

— সোনামণি আমার, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারবো বৈ কি মা।

পাশের ঘরে চলে গেলেন তিনি, মেয়ের বাপকে শোনালেন যে, মেয়ে হাতি চাইছে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে তক্ষুনি ওভারকোট পরে নিয়ে, মাথায় টুপি চাপিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন আধ-ঘণ্টা পরে, সাথে খুব দামী সুন্দর এক খেলনা: একটা বিরাট ছাইরঙা হাতি, নিজে নিজেই মাথা দোলাচ্ছে সে, লেজ নাড়ছে; হাতির পিঠে লাল টকটকে জিন, জিনের উপর সোনালি রংয়ের হাওদা, আর তার ভিতরে বসে আছে ছোট্ট-ছোট্ট তিন মনুষ্যি। খুকী কিন্তু



খেলনার দিকে তেমনি উদাসীনভাবে তাকিয়ে রইলো যেমন করে সে ছাদ বা দেয়ালের পানে তাকিয়ে থাকে; তারপর ম্লান কণ্ঠে বলে উঠলো:

— না, না। এরকম না মোটেই। সত্যিকারের, জীবন্ত হাতি চেয়েছিলাম আমি, আর এটা তো মরা।

— তাকিয়ে এক নজর দেখবি তো আগে, — বাবা বলে উঠলেন। — এক্ষুনি আমরা এতে দম দেবো, আর অমনি একেবারে জীবন্ত হাতির মতো হয়ে যাবে এটা।

চাবি দিয়ে দম দেয়া হলো হাতিটায়, আর তখন সে মাথা দুলিয়ে লেজ নাড়াতে নাড়াতে, এক-পা এক-পা করে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করলো টেবিলের ওপর। এসব মোটেই ভালো লাগলো না মেয়েটির, বরং বিরক্তিকর মনে হলো। কিন্তু বাবা যাতে দুঃখ না পান, তাই ফিস্‌ফিস্ করে নরমভাবে বললো:

— আব্বুমণি, তুমি আমার কত্তো ভালো আব্বু। আমার মনে হয়, এত সুন্দর খেলনা কিন্তু আর কারো নেই... কেবল... কেবল... মনে আছে আব্বু... অনেকদিন আগে সেই যে আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে বলেছিলে, সত্যিকারের হাতি দেখার জন্যে... কই, নিয়ে গেলে না তো।

— লক্ষ্মী মাণিক আমার, শোন্ একটু, সেটা কী করে হবে মা! হাতির যে বিরাট আকার, এই ছাদ পর্যন্ত উঁচু, আমাদের এই ঘরে আঁটবেই না... আর তাছাড়া, তাকে আমি পাবই বা কোথায়?

— আব্বু, অত বড়ো দরকার নেই তো... তুমি আমাকে একটা ছোট্ট দেখে এনে দাও, শুধু যেন তা জ্যান্ত হয়। ঠিক আছে, এই-এই এত্তোটুকু, কেমন... হোক না বাচ্চা হাতি।

— মা-মণি, আমার এই ছোট্ট মা-টার জন্যে আমি সব করতে পারি, কিন্তু তা বলে এটা কী করে পারবে? ধর, হঠাৎ তুই আমায় বললি: আব্বু, আকাশ থেকে সূয্যিটা পেড়ে আনো তো; এটাও তো সেরকম কথাই হলো, মা।

করুণ হাসি খেলে গেলো মেয়েটির মুখে।

— আব্বুটা কী বোকা! আমি যেন জানি না যে, সূয্যি পাড়া যায় না, কাছে গেলে পুড়িয়ে দ্যায়! আর চাঁদটাও তো পাড়া যায় না। নাঃ, আমি কেবল যদি একটা বাচ্চা হাতি পেতাম... সত্যিকারের।

তারপর সে চুপটি করে চোখ বুজলো, আস্তে করে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো:

— হয়রানি লাগছে আমার... একটু চুপ করে শুই, আব্বু...

বাবা দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলেন, দৌড়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ ধরে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পায়চারি করে বেড়ালেন। তারপর, কোনো কিছু যেন সিদ্ধান্ত করেছেন এমনিভাবে হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেঝেয় (এর জন্যে তিনি সবসময়ে মা-র বকাঝকা খান), চেঁচিয়ে ডাকলেন চাকরানীকে:

— ওল্‌গা! ওভারকোট টুপি দিয়ে যা!

বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন তাঁর স্ত্রী।

— কোথায় যাচ্ছ, সাশা? — জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা।

— জানি না, মাশেন্‌কা, কোথায় যাচ্ছি... তবে, মনে হচ্ছে, সন্ধ্যের দিকে এখানে, আমাদের বাড়িতে একটা জ্যান্ত হাতি সত্যিসত্যি নিয়ে আসতে পারবো।

উদ্বিগ্নভাবে তাঁর স্ত্রী তাকালেন তাঁর দিকে।

— কি গো, শরীর খারাপ করলো না কি তোমার? মাথা ধরেছে? হয়ত আজ ভালো ঘুম হয় নি তোমার?

— এক ফোঁটা ঘুমুই নি আমি,—মেজাজ খিঁচড়ে জবাব দিলেন বাবা।—মাথাটাথা খারাপ হলো কি না জিজ্ঞেস করতে চাও তো? না, এখনো হয় নি। আচ্ছা, গেলাম! সাঁঝবেলাতেই সব দেখতে পাবে।

দড়াম্‌ করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

৪

ঘণ্টাদুয়েক পরে তাঁকে দেখা গেলো বসে বসে সার্কাস দেখছেন, একেবারে সামনের সারিতে, দেখছেন ট্রেনিং-দেয়া পশুগুলো হুকুম অনুযায়ী কী রকম নানান কাণ্ডকারখানা করছে। বুদ্ধিমান কুকুর বটে—কেমন লাফাচ্ছে, ডিগবাজী খাচ্ছে, নাচছে, গান গাইছে, ঘেউ-ঘেউ গানের সাথে সাথে পিচবোর্ডের বড়ো-বড়ো অক্ষর গুছিয়ে রাখছে ঠিকঠাক। বাঁদরগুলো — কয়েকটা লাল ঘাগরা পরা, আর অন্যগুলো নীল প্যাণ্ট পরা — দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, বড়োসড়ো পুড্‌ল কুকুরের পিঠে চড়ে বসছে। বিশাল সব লালচে-বাদামী সিংহ জ্বলন্ত রিংয়ের ভিতর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে লাফ মেরে মেরে। একটা কদাকার সীল পিস্তল নিয়ে গুলি ছুঁড়লো। শেষের দিকে এলো হাতির খেলা। তিনটে হাতি: একটা বিরাট আর অন্য দুটো এক্কেবারে ছোটো, বামন, কিন্তু তাহলে কি হয় — ঘোড়ার চেয়ে আকারে অনেক বড়ো। কী বিশাল প্রাণী, আর কী রকম ঢিলেঢালা, আনাড়ী অথচ ভারি — কিন্তু এমন কঠিন-কঠিন খেলা দেখালো যে অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড়ও তা পারবে না। সবচেয়ে বড়োটাই সবচেয়ে সরেস। পিছন পায়ে ভর দিয়ে প্রথমে উঠে দাঁড়ালো সে, আবার বসে পড়লো, তারপর মাটিতে মাথা রেখে একেবারে শীর্ষাসন — পা শূন্যে, কাঠের তৈরী বোতলের উপর দিয়ে হেঁটে গেলো, ঘুরন্ত পিপের উপর হাঁটলো, পিচবোর্ডের তৈরী বইয়ের পাতা শুঁড় দিয়ে উল্টে দিতে লাগলো, আর সবশেষে, টেবিলের সামনে বসে বুকের উপর রুমাল ফেলে এক্কেবারে সুবোধ বালকের মতো লাঞ্চ করতে বসে গেলো।

খেলা শেষ হলো একসময়। দর্শকরা চলে যাচ্ছে একে একে। নাদিয়ার বাবা সার্কাসের মালিক, মোটাসোটা জার্মান ভদ্রলোকটির কাছে গেলেন। তিনি কাঠের বেড়ার কাছে বিশাল এক কালো চুরুট মুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

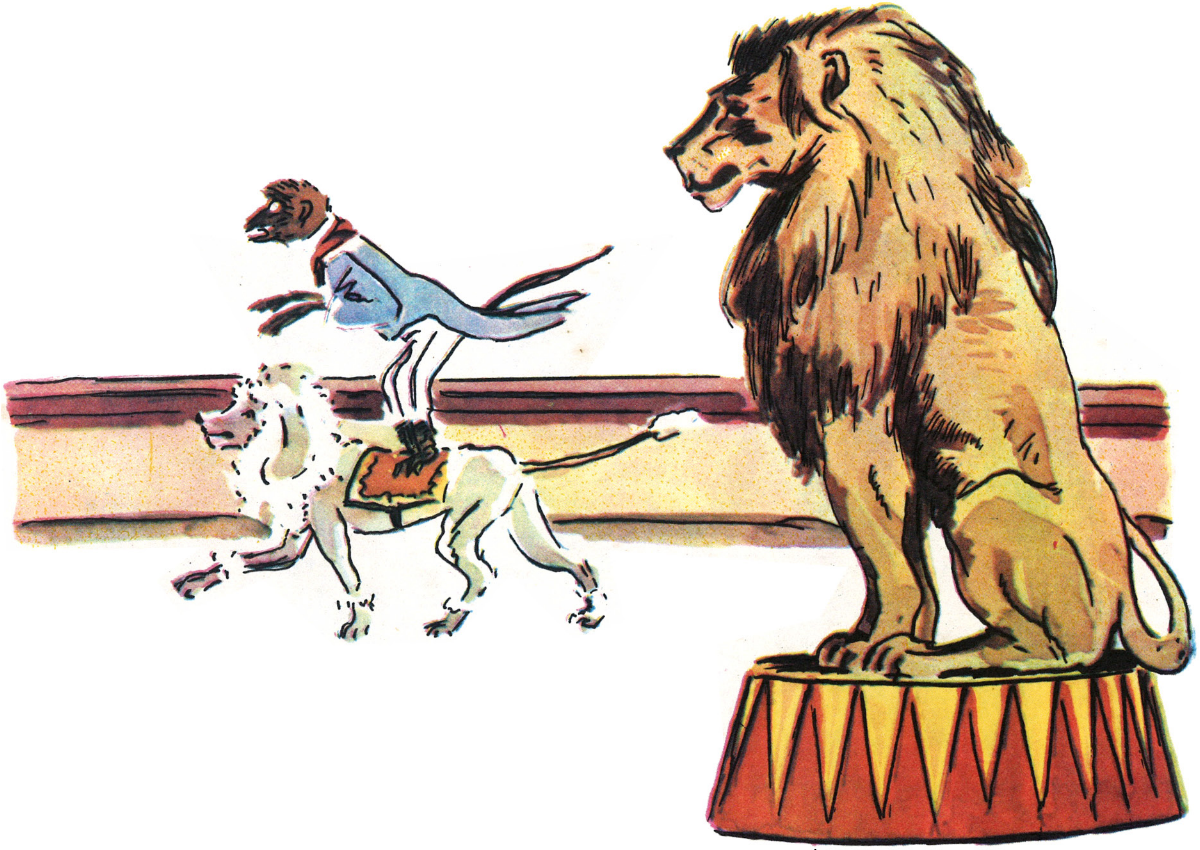


— দাদা, মনে করবেন না কিছু, একটা কথা বলতে চাই, — নাদিয়ার বাবা বললেন। — আপনার এই হাতি কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাড়িতে একটু নিয়ে যেতে দেবেন?

কথা শুনে জার্মান বেচারী তো হতভম্ব, চোখদুটো বড়ো-বড়ো করে তাকালেন, মুখ এ্যায়সা হাঁ হয়ে গেলো যে চুরুটটা পড়েই গেলো মাটিতে। তিনি হাঁসফাঁস করতে করতে নিচু হয়ে ঝুঁকে চুরুটটা তুলে নিলেন, মুখের মধ্যে ফের গুঁজে দিলেন সেটা, আর তারপরই কেবল মুখে কথা বেরুলো তাঁর:

— নিয়ে যেতে? হাতি? ঘরে? কী বলছেন, কিচ্ছু বুঝছি না।

জার্মানটির চোখ দেখে মনে হলো তিনিও যেন জিজ্ঞেস করতে চাইছেন — নাদিয়ার বাপের মাথার ব্যামো নেই তো... কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা যে কী সে বিষয়ে বিশদ বলেন নাদিয়ার বাবা: তাঁর একমাত্র মেয়ে নাদিয়ার এক সৃষ্টিছাড়া অসুখ হয়েছে, ডাক্তাররা পর্যন্ত ধরতে পারছে না অসুখটা কী। একমাস ধরে মেয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী, দিন-দিন রোগা আর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই তার ইচ্ছে নেই, কিছুই ভালো লাগে না তার, ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে মেয়ে তাঁর। ডাক্তাররা বলেছে তাকে যেন বেশ হাসিখুশিতে রাখা হয়, কিন্তু কিচ্ছু যে তার ভালো লাগে না; বলেছে, ওর সাধ-আহ্লাদ সব যেন আমরা মেটাই, কিন্তু কোনো কিছুতে যে তার সাধই যায় না। আজই শুধু তার মন গেছে যে, একটা জ্যান্ত হাতি দেখবে। তা, এটা কি একেবারেই অসম্ভব?



জার্মান ভদ্রলোকের কোটের বোতাম নাড়তে নাড়তে কাঁপা-কাঁপা গলায় ফের বললেন:

— বুঝলেন তো, এই হলো ব্যাপার... আমি নিশ্চয়ই চাই যে, মেয়ে আমার ভালো হয়ে উঠুক। কিন্তু... কিন্তু... ধরুন, হঠাৎ অসুখটা খারাপ দিকে মোড় নেয় যদি... যদি ও আর না বাঁচে?.. একটুখানি অন্তত ভেবে দেখুন, সারাটা জীবন এই চিন্তা কুরে কুরে কাটবে আমাকে যে, ওর শেষ ইচ্ছা, সবচেয়ে শেষ ইচ্ছাটাও আমি পূরণ করতে পারি নি!..

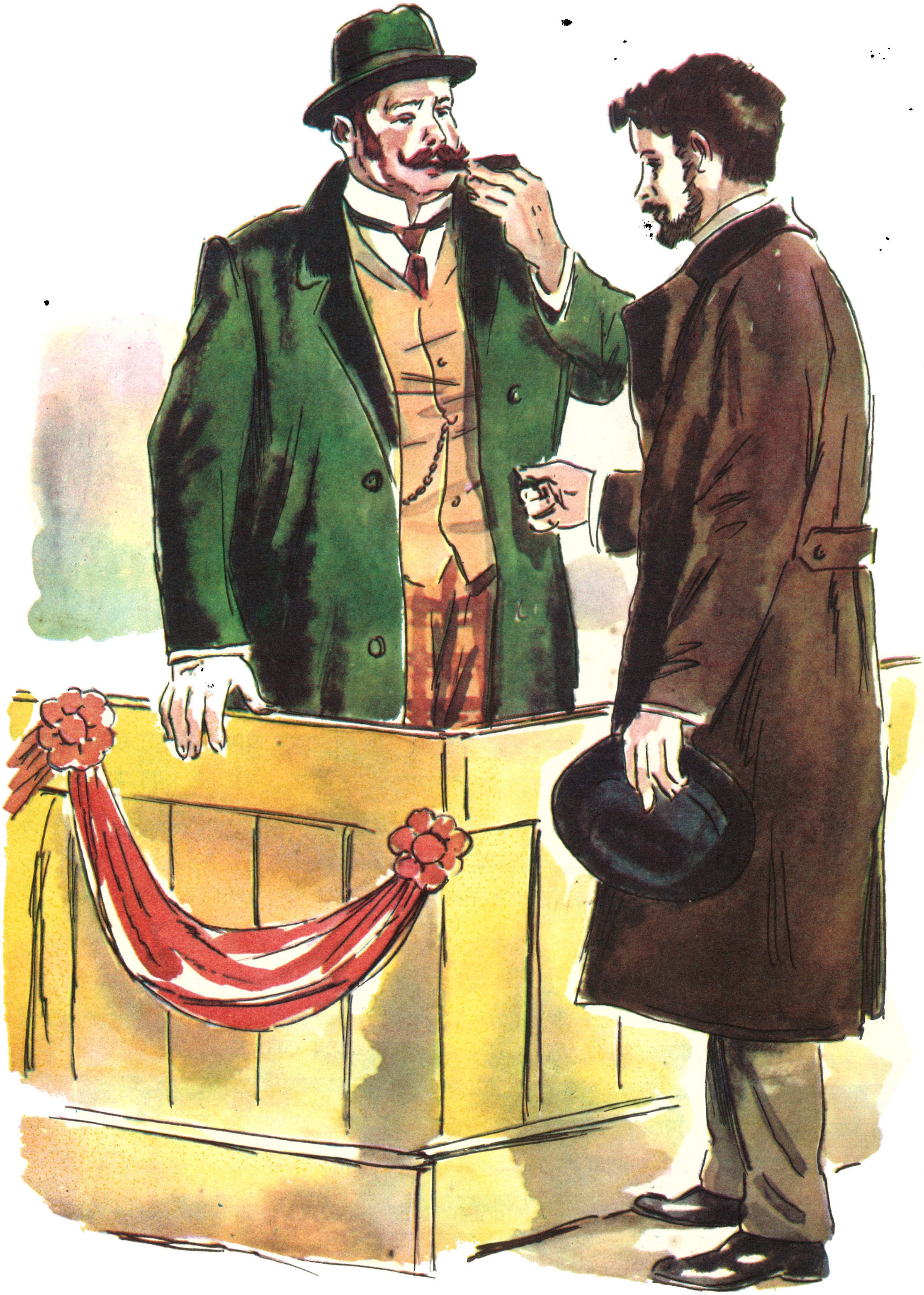
জার্মান ভদ্রলোক কপাল কুঁচকে কী ভাবতে ভাবতে বাঁ দিকের ভুরু চুলকাতে লাগলেন। শেষে বলে উঠলেন:

— হুঁ... তা, আপনার মেয়ের বয়েস কত?

— ছ'বছর।

— হুঁ... আমার লিজারও বয়েস ছয়... কিন্তু, মানে বুঝলেন তো, খরচা যে আপনার বড়ো বেশি পড়ে যাবে। হাতিকে নিয়ে যেতে হবে রাত্রিবেলা, আর কেবলমাত্র পরের দিন রাতেই তাকে ফেরত নিয়ে আসা সম্ভব। দিনের বেলা তো আর পারা যাবে না। লোকজনের মেলা ভিড় হয়ে যাবে তাহলে, সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে... সেজন্যেই, দাঁড়াচ্ছে এরকম যে, সারা দিনটাই আমার বরবাদ হবে, তা, আপনাকে তো সেটা পুষিয়ে দিতে হবে।

— নিশ্চয়ই, সে তো বটেই... তা নিয়ে আপনি ভাববেন না...



— তারপর, কথা হলো: কারো বাড়িতে হাতি নিয়ে যাওয়ায় পুলিশ অনুমতি দেবে তো?

— সেটা আমি দেখবো। অনুমতি দেবে।

— আরো একটা প্রশ্ন: আপনার বাড়ির মালিক তার বাড়িতে হাতি নিয়ে যেতে দেবে?

— দেবে। কেননা, ও-বাড়ির মালিক আমি নিজে।

— ওঃ, সে তো আরো ভালো! হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে: আপনারা থাকেন কোন্ তলায়?

— দোতলায়।

— হুঁ... এই তো মুশকিল হলো... আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে বেশ চওড়া সিঁড়ি, উঁচু ছাদ, প্রকাণ্ড বড়ো ঘর, খুব চওড়া দরজা আর ভয়ানক শক্ত মেঝে—এই সব হবে তো? কেননা, আমার টমি সাড়ে সাত ফুট উঁচু এবং সাড়ে বারো ফুট লম্বা। তাছাড়া, ওর ওজনও পঁয়তাল্লিশ মণ।

নাদিয়ার বাবা মিনিটখানেক কী ভাবলেন।

— আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? — তিনি বললেন। — আপনি এখন আমাদের ওখানে চলুন, নিজের চোখে জায়গাটায়গা সব দেখে আসবেন। দরকার হলে দরজা ভেঙে ঢোকার পথ চওড়া করে নেবো।

— অতি উত্তম!—সার্কাসের মালিক রাজী হয়ে গেলেন।

৫

রাত্রিবেলা অসুস্থ খুকীটির কাছে হাতি তো বেড়াতে চললো।

সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে গম্ভীরভাবে ঠিক রাস্তার মাঝখানটি দিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে চলেছে সে, শুঁড়টা একবার গুটিয়ে নিচ্ছে, একবার খুলছে—এমনিভাবে যাচ্ছে সে। অনেক রাত হয়ে গেলেও তার চারদিকে লোকজন ভিড় করে ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু হাতির সেসব দিকে কোনো নজরই নেই: সে তো রোজই সার্কাসে শ'য়ে শ'য়ে লোক দেখতে অভ্যস্ত। কেবল একবারই মাত্তর সে একটু চটে উঠলো।

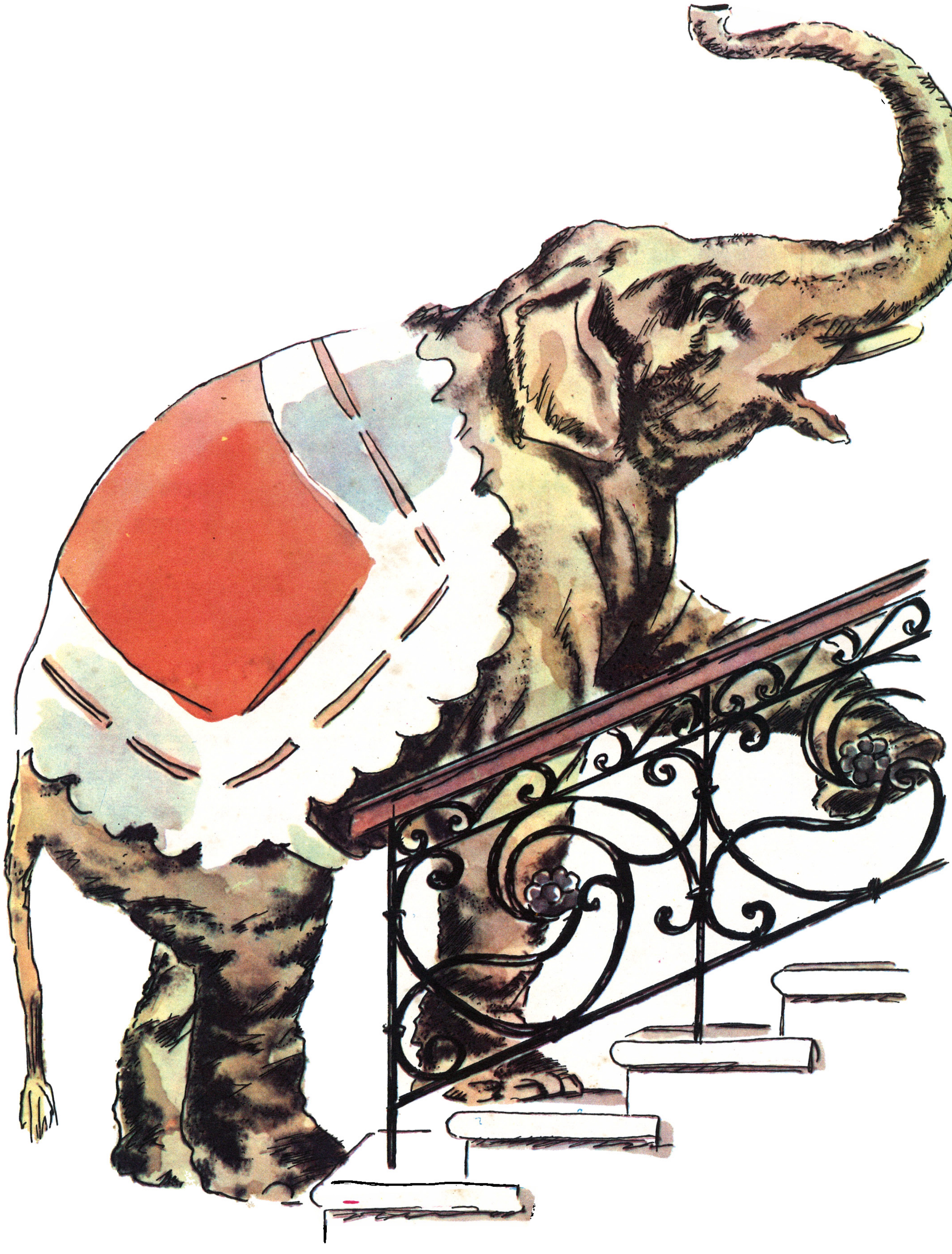
কে এক রাস্তার ছোঁড়া হুট্ করে দৌড়ে তার কাছে চলে গিয়ে ট্যাংভ্যাং করে সবাইকে হাসাতে শুরু করেছিলো।

তখন হাতিটা অতি শান্তভাবে শুঁড়টি দিয়ে কেবল তার মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিলো, আর পাশের একটা পেরেক-লাগানো বেড়া পার করে ছুঁড়ে ওদিকে ফেলে দিলো।

একটা পুলিশ এসে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে সবাইকে বলতে লাগলো:

— ভাইসব, আপনারা এবার যান তো! এতে তাজ্জব হবার মতো কী এমন দেখছেন আপনারা? কী কাণ্ড!.. রাস্তায় কখনো হাতি, জ্যান্ত হাতি দেখেন নি না কি?

বাড়ি এসে গেছে। সিঁড়ির মুখ থেকে খাবার ঘর পর্যন্ত যত দরজা সব হাতুড়ি মেরে রীতিমতো ভেঙে চওড়া করে হাতি যাবার পথ করা হয়েছে।





কিন্তু সিঁড়ির মুখে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লো হাতি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অবাধ্যতা শুরু করলো।

— ভালো খাবারটাবার কিছু দেয়া দরকার ওকে... — জার্মান ভদ্রলোক বলে উঠলেন। — এই, মিষ্টি রুটি কি আর কিছু... আঃহাঃ... টমি! এগো, এগো টমি!

নাদিয়ার বাবা পাশের রুটির দোকানে দৌড়ে গিয়ে পেস্তাবাদামের তৈরী বিশাল গোলাকার এক কেক কিনে আনলেন। হাতি তো পিচবোর্ডের বাক্সসুদ্ধ সব কেক খাবার জন্যে তৈরী, কিন্তু জার্মান ভদ্রলোক মাত্র সিকিটাক তাকে দিলেন। কেকের স্বাদ খুব চমৎকার মনে হলো টমির, আরো একটুকরো নেয়ার জন্যে শুঁড় বাড়ালো সে। কিন্তু জার্মানটি এবার একটু চালাকি করলেন।

খাবারটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন তিনি, আর সেই সাথে হাতিটাও শুঁড় বাড়িয়ে দিয়ে, কান ঝাপটাতে ঝাপটাতে তাঁর পিছন পিছন উঠতে লাগলো। উপরে উঠে তবে আরেক টুকরো পেলো টমি।

এভাবেই তাকে খাবার ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো, সেখান থেকে আগেভাগেই আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর বেশ পুরু করে খড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে মেঝেয়... মেঝেয় গেঁথে রাখা একটা রিংয়ের সাথে হাতির পা বেঁধে রাখা হলো। টাটকা গাজর, বাঁধাকপি আর শালগম তার সামনে ফেলে রাখা হলো। জার্মান ভদ্রলোক পাশেই একটা সোফাতে গা এলিয়ে দিলেন। বাতি সব নিভিয়ে দেয়া হলো, শুয়ে পড়লো সবাই।

৬

পরের দিন ভোরেই ঘুম ভেঙে গেলো খুকুমণির, তার পরেই প্রথম প্রশ্ন:

— হাতি কই? হাতি এসেছে?

— এসেছে বৈ কি, — মা উত্তর দিলেন। — কিন্তু তার হুকুম হলো: আমাদের নাদিয়া সর্বপ্রথম মুখ-হাত ধোবে, তারপর আধ-সেদ্ধ একটা ডিম আর গরম-গরম দুধ খাবে।

— আচ্ছা, ও কি ভালোমানুষ?

— ভালোমানুষ বৈ কি। লক্ষ্মী মেয়ে, খেয়ে নে এবার। এক্ষুনি তো আমরা ওর কাছে যাবো।

— খুব মজার দেখতে, না?

— তা আছে একটুখানি। গরম জামাটা এবার পরে নে।

ডিমটা তাড়াতাড়িই খাওয়া হয়ে গেলো, দুধের বেলাতেও তাই। ছোটোবেলায় যখন হাঁটতে শেখে নি তখন যে প্যারাম্বুলেটরে চড়ে সে ঘুরতো ঠিক সেইটাতেই নাদিয়াকে বসিয়ে খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

ছবিতে দেখে যেরকমটি ভেবেছিলো নাদিয়া, হাতিটা কিন্তু তার চাইতে বিরাট বড়ো মনে হলো। উঁচুতে দরজার চেয়ে এই এট্টুখানি কেবল ছোটো সে, আর লম্বায় খাবার ঘরের অর্ধেক। কী কর্কশ চামড়া তার, গভীর ভাঁজে ভাঁজে কুঁচকে আছে। থামের মতো মোটা-মোটা পা। লম্বা লেজের আগাটা যেন একটা বুরুশ। মাথার চাঁদি খুব ফুলো-ফুলো। বিশালাকার কান, যেন পদ্মপাতা, লটপট করে ঝুলছে। চোখ একেবারে কুঁতকুঁতে, কিন্তু বুদ্ধিমান আর মায়াভরা। তার গজদাঁত কেটে ফেলা হয়েছে। শুঁড়—অবিকল যেন লম্বা একটা সাপ, আর তার আগায় নাকের ফুটোদুটো, তারি মধ্যিখানে একটা নরম আঙুল চুল্‌বুল্‌ করছে যেন। হাতিটা যদি তার শুঁড় সবটা টানটান মেলে ধরে, তাহলে নির্ঘাত জানলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে।

মেয়েটা কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পায় নি। সে কেবল জন্তুটার বিশাল আয়তনের বহর দেখে একটু হকচকিয়ে গেছে। অথচ তার আয়া—ষোলো বছরের পোলিয়া কিন্তু ভয়ে হাউমাউ শুরু করে দিয়েছে।

হাতির মালিক, জার্মান ভদ্রলোক প্যারাম্বুলেটরের কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন:

— এসো, এসো, খুকী! ভালোমতো ঘুমিয়েছিলে তো? ভয় পেও না যেন। টমি আমাদের খুব ভালোমানুষ, আর ছেলেপিলে পছন্দ করে।

খুকী তার ছোট্ট ফ্যাকাসে হাত জার্মান ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

— আদাব, আপনি ভালো আছেন?—উত্তর দিলো মেয়েটি।—আমি একরত্তিও ভয় পাই নি। ওর নাম কি?

— টমি।

— আদাব, টমি।—বলে উঠলো সে, মাথা ঝাঁকালো। হাতিটা এতই বিরাট যে তাকে 'তুই' বলা সঙ্গত মনে হলো না মেয়েটির।—রাত্তিরে ভালোমতো ঘুমিয়েছিলে তুমি?

সে তার দিকেও হাত বাড়িয়ে দিলো। অত্যন্ত সাবধানে হাতটা তুলে নিলো হাতি, তারপর নিজের চুল্‌বুলে শক্তসমর্থ আঙুল দিয়ে তার ফুরফুরে নরম হাতে আস্তে করে চাপ দিলো, এ কাজটা সে ডাক্তার মিখাইল পেত্রভিচের চেয়েও অনেক মৃদুভাবে সম্পন্ন করলো। সেই সাথে মাথাটাও কিঞ্চিৎ নাড়ালো সে, আর তার ছোট্ট চোখ আরো সরু হয়ে এলো, ঠিক সে হাসছে তখন।

— ও দেখি সব বোঝে?—জার্মানকে জিজ্ঞেস করলো খুকী।

— নিশ্চয়ই, সব বুঝতে পারে, খুকী।

— খালি কেবল কথা কইতে পারে না, তাই না?

— তাই তো, শুধু কথা বলতে পারে না—এই যা। জানো তুমি, আমারও কিন্তু একটা মেয়ে আছে, এই এত্তোটুকু, ঠিক তোমার মতো। তার নাম লিজা। টমির সাথে তার দারুণ, রীতিমতো দারুণ ভাব।

— ভালো কথা, টমি, তুমি কি চা খেয়ে ফেলেছো?—হাতিকে জিজ্ঞেস করে উঠলো মেয়েটি।

হাতিটা তার শুঁড় বাড়িয়ে দিলো পুনর্বার, তারপর মেয়েটির মুখে জোরে গরম নিঃশ্বাস ছুঁড়ে মারলো, যার ফলে খুকীর মাথার নরম চুল এলোমেলো ছড়িয়ে পড়লো এদিক-ওদিক।

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো নাদিয়া, হাততালি দিলো। জার্মানটি এক গাল হাসলেন।

তিনি নিজেও তাঁর হাতির মতোই বিরাট, মোটা, আর দয়ালু—নাদিয়ার মনে হলো ওদের দু'জনের চেহারায় মিল আছে। কে জানে, হয়ত ওরা আত্মীয়?

— না, ও চা খায় নি, খুকী। সরবত খেতে খুব ভালোবাসে ও; বান্‌ রুটিও ওর খুব পছন্দ।

ট্রেতে করে বান্‌ রুটি নিয়ে আসা হলো। মেয়েটি খাওয়াতে লাগলো হাতিকে। হাতি নিপুণভাবে তার ঐ আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরলো বান্‌ রুটি, শুঁড় গোল করে গুটিয়ে মুখের মধ্যে কোথায় ভিতরে পাঠিয়ে দিলো — সেখানে, ভিতরে বড়ো মজার দেখতে, তেকোণা, লোমশ তার নিচের ঠোঁট রয়ে গেছে। খস্‌খসে চামড়ায় বান্‌ রুটি চিবুবার আওয়াজ শোনা গেলো। টমি একই ভঙ্গিতে আরেকটা বান্‌, তারপর তৃতীয়টাও, এরপর চতুর্থটাও, তারপর পাঁচ নম্বর বান্‌টিও পূর্ববৎ ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে ধন্যবাদের ভঙ্গিতে মাথা

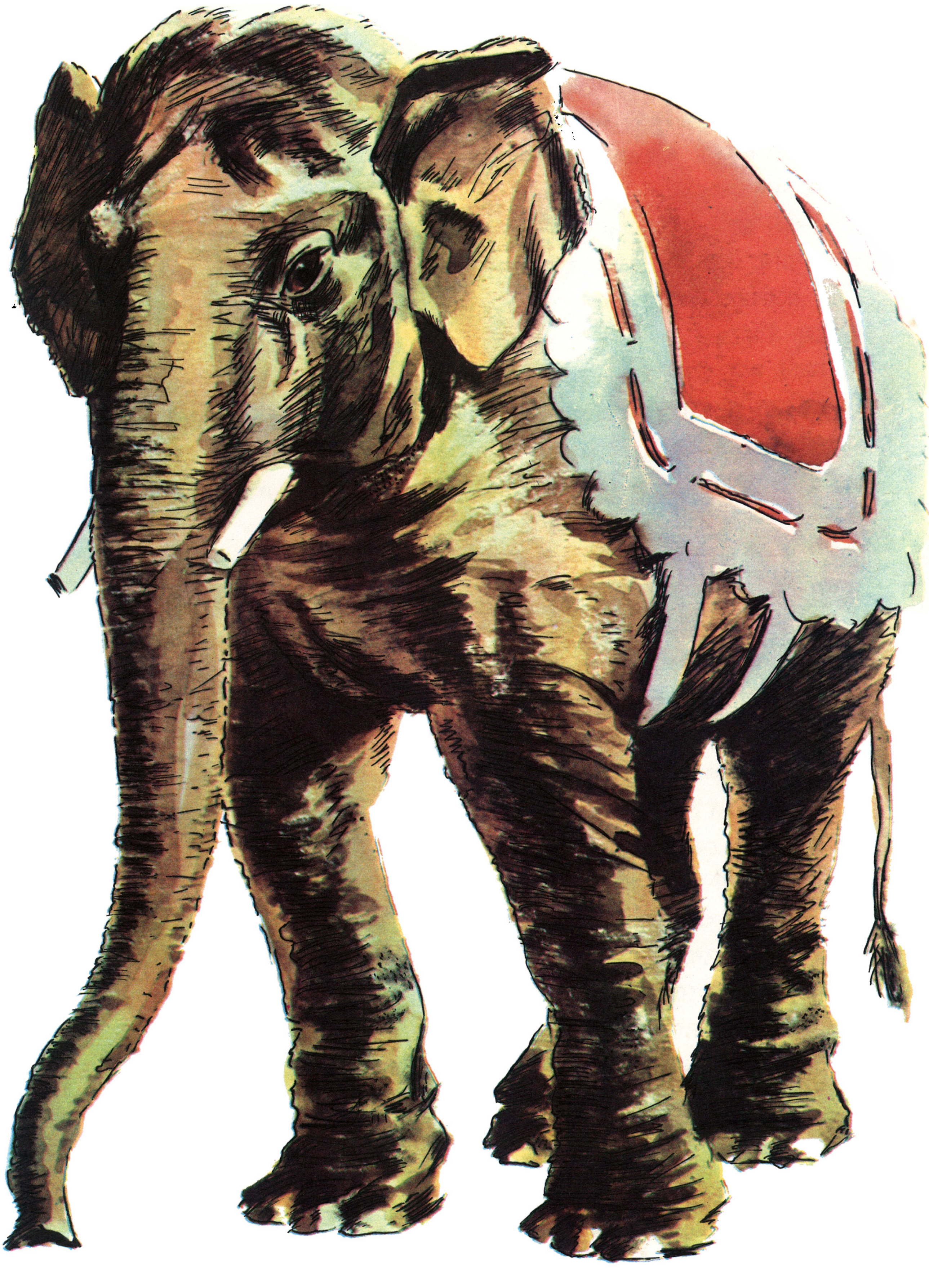
নাড়তে লাগলো, আর তার ক্ষুদে-ক্ষুদে চোখদুটো তৃপ্তিতে আরো ছোটো হয়ে এলো। আর খুকী খুশিতে খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে লাগলো।

সব বান্‌ রুটি যখন খাওয়া শেষ হলো, তখন নাদিয়া তার পুতুলগুলো চিনিয়ে দিতে লাগলো হাতিকে:

— টমি, এই যে দ্যাখো, ভালো কাপড়জামা পরা এই পুতুল—এ হলো সোনিয়া। খুব ভালো মেয়ে এ, তবে একটু খামখেয়ালী, সুপ খেতে চায় না। আর এ হলো — নাতাশা, সোনিয়ার মেয়ে। এর মধ্যেই লেখাপড়া শিখতে শুরু করে দিয়েছে, জানো, আর প্রায় সব অক্ষরই সে এখন চেনে। আর এইটা—এ হচ্ছে মাত্রিওশ্‌কা। এ আমার সবচেয়ে পয়লা নম্বর পুতুল। এই যে দ্যাখো-না, ওর নাক নেই, মাথা আঠা দিয়ে জোড়ানো আর একদম চুল নেই মাথায়। তা বলে তো আর বুড়ী মানুষকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারি না। ঠিক বলি নি, টমি? আগে সোনিয়ার মা ছিল এই মাত্রিওশ্‌কা, আর এখন সে আমাদের রাঁধুনি। আচ্ছা, এবার একটু খেলি এসো, টমি: তুমি বাবা হবে, আর আমি—মা, আর এরা আমাদের ছেলেমেয়ে।

টমি রাজী। সে হাসছে, মাত্রিওশ্‌কাকে ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে এলো। নাঃ,





এটা কেবল তামাসা। একটুখানি চিবিয়ে পুতুলটা আবার মেয়েটির কোলের উপর রেখে দিলো,— হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু ভিজে-ভিজে আর তোবড়ানো অবস্থায় তো বটেই।

এরপর নাদিয়া ছবিওলা এক বিরাট বই তাকে দেখাতে লাগলো আর বুঝিয়ে দিতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে:

— এটা হলো ঘোড়া, আর এটা একটা ক্যানারি পাখি, আর এটা বন্দুক... এই হলো খাঁচার ভিতর পাখি, এই—বালতি, আয়না, চুলো, বেলচা, কাক... আর এইটা, দ্যাখো তো কী, হ্যাঁ, হাতি! একেবারে তোমার মতো নয়, ঠিক না? হাতি আবার কখনো এত ছোটো হয় না কি, কি বলো টমি?

টমিরও মনে হলো, অত ছোটো হাতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কখনো কোথাও নেই। মোটের ওপর ছবিটা ভালো লাগলো না তার। সে তার আঙুল দিয়ে বইয়ের পাতার একটা কোণ ধরে পাতা উল্টে দিলো।

এদিকে দুপুরের খাবারের সময় হয়ে আসছে, কিন্তু হাতির কাছ থেকে সরানোই যায় না মেয়েকে। জার্মান ভদ্রলোকই সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন:

— আমার হাতে ছেড়ে দিন, স-ব ঠিক করে দিচ্ছি। ওরা একসঙ্গে বসে খাক।

হাতিকে বসতে হুকুম করলেন তিনি। আদেশমতো বসে পড়লো হাতি, সেই সাথে ঘরের সারা মেঝে কেঁপে উঠলো, আলমারিতে বাসনপেয়ালাগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠলো, আর নিচের তলার ঘরে ছাদ থেকে খসে পড়লো পলেস্তারা। হাতির মুখোমুখি খুকী বসলো। মাঝখানে টেবিল পাতা হলো। হাতির বুকের উপর ঘাড় ঘুরিয়ে একটা টেবিলের চাদর বেঁধে দেয়া হলো, তারপর দুই নতুন বন্ধু খাওয়া শুরু করলো। খুকী খেলো মুরগির সুপ আর কাট্‌লেট, আর হাতি—নানান রকম ফলমূল আর স্যালাড। মেয়েকে ছোট্ট একটা গ্লাসে শেরী দেয়া হলো খেতে, আর হাতিকে—ব্র্যাণ্ডি মেশানো গরম পানি, সে তো মহানন্দে গামলা থেকে শুঁড় দিয়ে তুলে তুলে এই সরবত খেতে লাগলো। এরপর দেয়া হলো মিষ্টান্ন: মেয়েকে এক বাটি কোকো, আর হাতি পেলো আধ-ফালি কেক, এবার অবশ্য আখরোট দেয়া। এতক্ষণ এই সমস্ত সময়টুকু ধরে জার্মান ভদ্রলোক বাবার সাথে বৈঠকখানায় বসে তাঁর হাতির মতোই আনন্দে সময় কাটিয়েছেন, বসে বসে বীয়ার খেয়েছেন—কেবল পরিমাণটা যথেষ্ট বেশি।

খাওয়াদাওয়ার পরে চেনাজানা বাবার বন্ধুবান্ধব এলেন যেন কারা: বারান্দাতেই হাতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হলো তাঁদের, যাতে তাঁরা ভয় না পান। প্রথমে তাঁরা বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু পরে টমিকে দেখে দরজার মুখেই তাঁরা ঠেলাঠেলি করতে লাগলেন।

— ভয় পাবেন না, ও খুব ভালোমানুষ! — খুকী সান্ত্বনা দ্যায় তাঁদের।

কিন্তু পরিচিতরা সবাই তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলেন, তারপর মিনিট পাঁচেক বসেই বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দেরী হয়ে গেছে। মেয়েটির ঘুমুবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু হাতির কাছ





থেকে নড়ানোই সম্ভব হচ্ছে না মেয়েকে। সেভাবেই সে ঘুমিয়ে পড়লো হাতির পাশে, পরে ঘুমের মধ্যেই তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এমন কি কাপড়চোপড় খুলে দেয়ার সময়ও সে বুঝতেই পারে নি।

সেই রাত্রেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলো নাদিয়া যে, টমির সাথে তার বিয়ে হয়েছে, আর তাদের ছেলেপুলে অনেক — ছোট্ট হাসিখুশি বাচ্চা হাতির পাল। হাতিও — তাকে রাত্রেই সার্কাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো — স্বপ্নে এই মিষ্টি, আদুরে মেয়েটিকে দেখতে পেলো। এছাড়াও সে দেখলো বিরাট বড়ো-বড়ো কেক, পেস্তাবাদাম আর আখরোট দেয়া, ফটকের মতো উঁচু...

সকাল হতেই হাসিখুশি, টাটকা হরহরে — ঠিক আগে যেরকম ছিল সেইরকম সুস্থ শরীরে ঘুম ভাঙলো খুকীর। ভয়ানক জোরে আর অস্থিরভাবে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুললো:

— দুধ হবে-এ-এ?

এই চিৎকার শুনে মা খুশি হয়ে দৌড়ে এলেন।

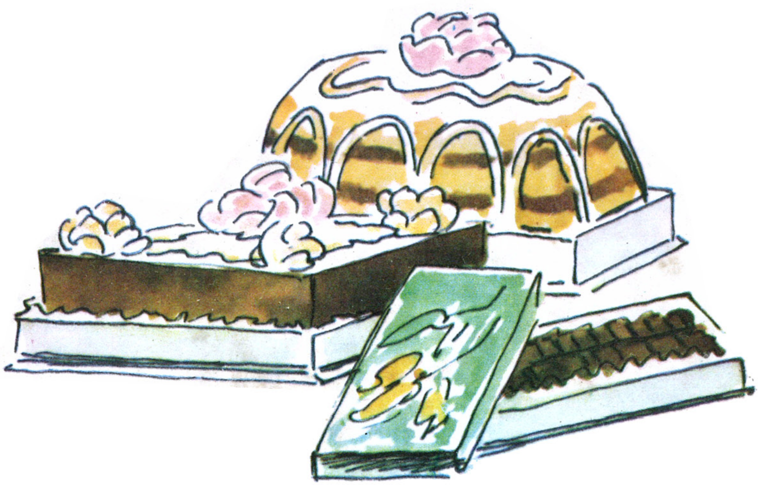
কিন্তু গতকালের কথা মনে আছে মেয়ের, সে জিজ্ঞেস করে উঠলো:

— হাতি কই?

বোঝানো হলো তাকে যে, দরকারী কাজে বাড়ি গেছে হাতি, তার তো ছেলেমেয়ে আছে — ওদের একা ছেড়ে রাখা যায় না, সে আদাব জানিয়েছে নাদিয়াকে এবং সে ভালো হয়ে উঠে কবে তার বাসায় নেমন্তন্ন খেতে আসবে, তার জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে।

খুকী দুষ্টুমির হাসি হেসে বললো:

— টমিকে তাহলে জানিয়ে দাও, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি!



А. Куприн. СЛОН
На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

К $\frac{70802\text{-}696}{014(01)\text{-}81}$ 705-81 4803010102



ছোট্ট মেয়েটির বড়ো সাংঘাতিক অসুখ। উজ্জ্বল সোনালী রোদ্দুর তার ভালো লাগে না, ভালো লাগে না মা-র আদর, বন্ধুবান্ধবদের রংচংয়ে খেলনা। এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত ধরতে পারেন না অসুখটা কী, এদিকে মেয়ে দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে...

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠলো মেয়েটি; আর ভালো করলো তাকে বিরাটাকার খুব ভালোমানুষ একটি হাতি। পোষমানানো হাতি বেড়াতে এসেছিলো তার কাছে। সে-ই রোগ সারালো শেষ পর্যন্ত।

'হাতি' গল্পটি ছোটো-ছোটো খোকাখুকুর জন্যে অনেক, অ-নে-ক দিন আগে লিখে রেখে গেছেন বিখ্যাত রুশ গল্পকার আলেক্সান্দর কুপ্রিন (১৮৭০-১৯৩৮)। বর্তমানে এই গল্প চিরায়ত শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে গেছে।

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো